গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৩০ মে ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম-এর নজিরহীন সন্ত্রাস

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের মাথা তোলার সুযোগ করে দিচ্ছে

এবার ষষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সন্ত্রাস ভোটের পরও অব্যাহত। ১১ মে, শুধু ভোটের দিনেই ১৮ জন মানুষ মারা যান। এরপরও প্রায় প্রতিদিনই গ্রামবাংলার কোথাও না কোথাও এক বা একাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটছে। পরিস্থিতি এতই ভয়ঙ্কর যে, মানুষের মৃত্যু এখন নিছক সংখ্যায় পরিণত হয়েছে এবং সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই ৩০-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে।

সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের শাসনে ভোটকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস এইবার প্রথম ঘটল, তা নয়। একথাও এই রাজ্যের মানুষ জানেন, ভোটের সময় ছাড়াও এরাজ্যে সন্ত্রাস চলে, এবং গ্রামবাংলায় সেই সন্ত্রাসের রূপ অত্যন্ত মারাত্মক। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যতই বলছেন, এই রাজ্য আইনশৃংখলার মরূদ্যান, ততই পশ্চিমবঙ্গ ক্রিমিনালদের উন্মুক্ত ময়দানে পরিণত হচ্ছে। একথাও আজ প্রমাণিত যে, অন্যান্য বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থী দল কংগ্রেস-বিজেপি'র মতই সিপিএমের রাজনীতিও ক্রিমিনাল তৈরি করেছে, তাদের আশ্রয় দিয়ে বড় করেছে। ভোটের সময় এই ক্রিমিনালরাই সিপিএমের হয়ে কাজ করে।

বিধানসভা-লোকসভা-পুরসভা-পঞ্চায়েত নির্বাচনেই কেবল নয়, কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচন থেকে স্কুল কমিটি, বাজার কমিটি ইত্যাদি যেকোন কমিটি নির্বাচনেও বেশ কিছুকাল ধরে কারচুপি ও সন্ত্রাস সিপিএমের অন্যতম হাতিয়ার। প্রকাশ্য সন্ত্রাস ছিলই। কিন্তু তার সাথে ছিল গোপন সন্ত্রাস — যেখানে আপাত অর্থে বাইরে কোন দাপাদাপি নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে, সিপিএমের বিরুদ্ধে কথা বললে, কাজ করলেই সমূহ সর্বনাশ।

কিন্তু এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে আকারে সন্ত্রাস চালানো হল, তা ইতিপূর্বে এরাজ্যে কখনও ঘটেনি। ভোটের দিন ১৮ জন মানুষের মৃত্যুর পরও মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্দ্বিধায় নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ বলে সার্টিফিকেট দিলেন। তখনই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, এই সন্ত্রাসের পিছনে শাসক দল ও প্রশাসনের পূর্ণ মদত ছিল। সিপিএম নেতারা বলেছেন, এই সন্ত্রাসের জন্য বিরোধী দলগুলিই দায়ী। এই বক্তব্যের এক কণাও যদি সত্য হত, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী এই নির্বাচনকে 'শান্তিপূর্ণ' বলে সার্টিফিকেট দিতেন না।

সিপিএম নেতারা আরও বলেছেন, ভোটের সন্ত্রাসে সিপিএম দলভুক্তরাই মারা গিয়েছে বেশি, শিকার হয়েছে। সিপিএম কর্মীদের এতেই নাকি প্রমাণ হয়, সিপিএম নিহত হওয়ার প্রতিটি ঘটনা সন্ত্রাস করেনি, বরং তারাই সন্ত্রাসের

আটের পাতায় দেখুন

সি পি এম দলে সমাজবিরোধীদের অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ২০.৫.২০০৩ এক বিবৃতিতে বলেন — 'দল বড় হয়েছে বলে কিছু সমাজবিরোধী ঢুকে পড়েছে' — এই উক্তির দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী চাতুর্যের সাথে সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সি পি আই (এম) নেতৃত্ব জেনে বুঝেই গদিসর্বস্ব রাজনীতির স্বার্থে নীতি-আদর্শ-মূল্যবোধ সব জলাঞ্জলি দিয়ে দলে সমাজবিরোধীদের ভিড় করিয়েছে, তৈরি করেছে এবং ভোটে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে কাজে লাগাচ্ছে। এই কাজে দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের অর্থশক্তি এবং পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করছে। দুর্নীতি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ ইত্যাদি নানা অপরাধে লিপ্ত দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। ফলে আজ সি পি আই (এম) দলের সৎ-কর্মী সমর্থকরা কোণঠাসা হচ্ছেন, হতাশায় ভুগছেন, নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছেন এবং দল পুরোপুরি অর্থ ও পেশীশক্তি নির্ভর হয়ে গেছে।

তেলের দাম কমেছে, বাসের ভাড়া কমানোর দাবিতে জেলায় জেলায় এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ, অবরোধ

২৩ মে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবরায় যশোর রোডের অবরোধে পুলিশের লাঠিচার্জ

পর পর তিন দফায় ডিজেলের দাম কমে যাওয়া সত্ত্বেও পরিবহনের বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার না করায় অবিলম্বে বাড়তি ভাড়া প্রত্যাহার সহ ৬ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে রাজ্যের জেলাগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গত ২৩ মে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পথ অবরোধ করা হয়। অবরোধ ভাঙতে বামফ্রন্টের পুলিশ নানা স্থানে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং জেলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সহ ৮৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। দলের মহিলা কর্মীদের উপর লাঠি চালাতেও পুলিশ দ্বিধা করেনি। গুরুতর আহত অবস্থায় বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ পুলিশি জুলুম ও গ্রেপ্তারির তীব্র প্রতিবাদ করে অবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি ও বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার সহ ছয় দফা দাবি পূরণের দাবি জানান।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে সকাল আটটা থেকে প্রধান সড়ক জি টি রোড অবরোধ করা হয়। অবরোধ চলে সাড়ে নটা পর্যন্ত। সাড়ে নটায় বিরাট পুলিশবাহিনী এসে অবরোধ ভাঙে।

উত্তর চব্বিশ পরগণার গাইঘাটায় যশোহর রোডে অবরোধ ভাঙতে পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। লাঠির ঘায়ে কমরেড স্বপন গোস্বামীর মাথা ফেটে যায়। বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মীও আহত হন। তিনজন মহিলা সহ ১২জন অবরোধকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

হাবরায় যশোহর রোডে অবরোধ চলে ৪০ মিনিট। তারপর পথ অবরোধকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে কয়েকজন এস ইউ সি আই কর্মী আহত হয়। ৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ব্যারাকপুরে বি টি রোডে পঁচিশ মিনিট অবরোধের পর পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

বারাসাতে চাঁপাডালি মোড়ে ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কমরেড জয়ন্ত সাহা, কমরেড অনুকূল ভদ্র, কমরেড স্বপন মণ্ডল সহ কুড়িজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বসিরহাট চৌমাথায় টাকি রোড ২৫ মিনিট অবরুদ্ধ থাকার পর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। কমরেড অজয় সাহা, কমরেড সবিতা কর্মকার, কমরেড শিখা দাস সহ বেশ কয়েকজন আহত হন।

বর্ধমান জেলায় বর্ধমান স্টেশন মোড়, অণ্ডাল মোড়, কুলটির নিয়ামতপুরে পথ অবরোধ হয়। কাটোয়া বাস স্ট্যাণ্ডে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলে।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে পুরসভা মোড়ে আধঘন্টা অবরোধ চলার পরই পুলিশ জবরদস্তি অবরোধ ভেঙে দেয় ও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে।

বাঁকুড়া জেলার ধলডাঙা মোড়ে ৪০ মিনিট, স্টেশন রোডে ৩৫ মিনিট অবরোধ চলে। শালতোড়া ও লক্ষ্মণপুরে পথ অবরোধ হয়।

চারের পাতায় দেখুন

অযোধ্যায় খননকার্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ?

অযোধ্যায় খননকার্যের মাধ্যমে রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত বিতর্কটি সমাধানে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করা কতদূর সম্ভব ? যথার্থই সত্য জানার জন্যই কি এই খননের আদেশ দেওয়া হয়েছে ? নাকি এর পিছনে গভীরতর সাম্প্রদায়িক পরিকল্পনা রয়েছে ? সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের দেওয়া একটি রায়কে কেন্দ্র করে এইসব প্রশ্ন গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে চিন্তিত করেছে। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য অল বেঙ্গল কমিউনাল হারমনি কমিটি গত ৮ মে কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক-সাহিত্যিক গীতেশ শর্মা ও জননেতা মানিক মুখোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল।

সভার প্রধান বক্তা আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার বলেন, বাবরি মসজিদ নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যে মামলা চলছে তার মূল বিচার্য বিষয় হল, বাবরি মসজিদ যে জমিটির ওপর নির্মিত, সেই জমিটির প্রকৃত মালিকানা বাবরি মসজিদের, নাকি রাম জন্মভূমি ন্যাসের — তা নির্ণয় করা। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে মূল সমস্যার মুখ অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে এখন বিচার্য বিষয় দাঁড়িয়েছে ঐ জায়গায় রামমন্দির ছিল কিনা তা নির্ণয় করা।

আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার আরো বলেন, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় ঐ জায়গায় একটা মন্দির পাওয়া গেছে, তাহলেও এ'কথা কীভাবে প্রমাণিত হবে যে ঐ মন্দির ভাঙা হয়েছিল ? ভাঙা হলেও কে তা ভেঙেছিল, কী করে তা প্রমাণিত হবে ? যদি রামের কোনও মূর্তিও পাওয়া যায়, তাহলেও কীভাবে বলা যাবে যে ওখানে রাম মন্দিরই ছিল ? বহু প্রাসাদেও এ'ধরনের মূর্তি থাকতে পারে।

তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, অযোধ্যায় আরো ১৮টি মন্দির আছে যেগুলিকে রামের জন্মস্থান বলে দাবি করে ভক্তরা ; এর মধ্যে কোনটিকে মানুষ গ্রহণ করবে ? ১৬০০ বছর আগে রামচন্দ্রের জন্ম ঠিক কোনখানটাতে হয়েছিল তা কী করে সঠিকভাবে বলা সম্ভব ?

তিনি বলেন, একজন আই এ এস অফিসার শের সিং প্রচুর গবেষণা করে দাবি করেছিলেন যে, রামের অযোধ্যা বলে যে জায়গাকে আমরা চিহ্নিত করি, প্রকৃতপক্ষে তা রামের অযোধ্যা নয়। ইতিহাস ঘেঁটে আসল অযোধ্যার যে প্রাকৃতিক বিবরণ পাওয়া যায়, তা অনেকটা আফগানিস্তানের সঙ্গে মেলে। ফলে হতে পারে যে অযোধ্যা আসলে আফগানিস্তানেই ছিল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, বাবরি মসজিদের মধ্যে যে ফলক পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, বাবরি মসজিদ আসলে বাবরের বানানো নয়। এটা বানিয়েছিলেন মীর বাকি খান, বাবরের আওয়াধ (অযোধ্যা যে বৃহৎ অঞ্চলের একটি অংশ মাত্র) বিজয়ের স্মৃতিতে। কিন্তু পরবর্তীকালে শের সিং বহু প্রামাণ্য নথিপত্রের সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসেন যে, মসজিদের ঐ ফলক ইংরেজরা লাগিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

১৮৫৫ সালের আগে পর্যন্ত রামমন্দির-বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত কোনও বিতর্কের অস্তিত্বই ছিল না। ইংরেজরাই এর সৃষ্টিকর্তা। আমাদের দেশের আর এস শর্মা, বিপান চন্দ্র প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকেরা বহু প্রমাণ সহযোগে বলিষ্ঠভাবে বলেছেন যে, ওখানে মন্দিরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এ'সবই হল ইংরেজ এবং আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের মানুষজনের সৃষ্টি করা।

১৯৪৮ সালে যখন দেশভাগজনিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল, সেই সময় কিছু লোক রাতে মন্দিরের তালা ভেঙে রাম-সীতার মূর্তি রেখে যায় এবং বলতে শুরু করে এখানে রাম-জন্মভূমি ছিল। এরপর ফৈজাবাদ কোর্টে দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমা শুরু হয়। সে'সময় এটা কোনও রাজনৈতিক বিতর্ক হিসাবে আসেনি। হঠাৎ ১৯৮৬তে এটাকে রাজনৈতিক বিতর্কের রূপ দেওয়া হল। ডঃ ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন তোলেন, ১৯৮৬-র আগে পর্যন্ত বি জে পি কী করছিল ? এই সময়ের আগে পর্যন্ত কি তারা রামভক্ত ছিল না ? আসলে এ ছিল এক রাজনৈতিক চাল। এর সাথে ওখানে মন্দির থাকা না-থাকার কোনও সম্পর্ক নেই। এদেশের কোনও প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাম মন্দিরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেননি।

হিন্দি রামায়ণের রচয়িতা তুলসীদাসের কথা উল্লেখ করে ডঃ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, তুলসীদাস ছিলেন আকবরের সমসাময়িক। যদি রামমন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ বাবর সত্যিই তৈরি করতেন, তাহলে শ্রেষ্ঠ রামভক্ত তুলসীদাস তাঁর কোনও না কোনও রচনায় সে কথার উল্লেখ করতেন না ? সেই সময়কার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন আবদুর রহিম খান খানান। এঁর সাথেও তুলসীদাসজির প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হত। সেইসব চিঠিপত্রেও কোথাও এ ঘটনার কোনও উল্লেখ নেই।

তিনি বলেন, এসব সত্য মানুষের সামনে এসেছে। কিন্তু শাসকশ্রেণীর হাতে প্রচারযন্ত্রের যে বিরাট ক্ষমতা থাকে তার সাহায্যে তারা বহু ভুল ধারণা জনমানসে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং এভাবেই প্রচার করা হয়েছে যে, মুসলমান শাসকরা বহু হিন্দু মন্দির ভেঙেছে, ফলে বাবরও নিশ্চয়ই রাম মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত সিদ্ধান্ত ভুল।

অযোধ্যার খননকার্যে যে সমস্ত নিদর্শন এখনও পর্যন্ত মিলেছে, সেগুলি সবই মুসলিম জমানার। এখনও পর্যন্ত হিন্দু মন্দির থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার মন্তব্য করেন, অযোধ্যা সংক্রান্ত মামলার কীভাবে নিষ্পত্তি হবে তা এখনই বলা মুশকিল। কিন্তু যদি ওখানে রাম মন্দির তৈরি করাও যায়, তাহলেও দেশের সাধারণ মানুষের কোন্ সমস্যাটার সমাধান হবে ? শ্রোতাদের কাছে তিনি অনুরোধ জানান, তাঁরা সবাই যেন যুক্তিনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণ করে তবেই কোনও সিদ্ধান্ত করেন। যে কায়েমী স্বার্থ জনগণের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে

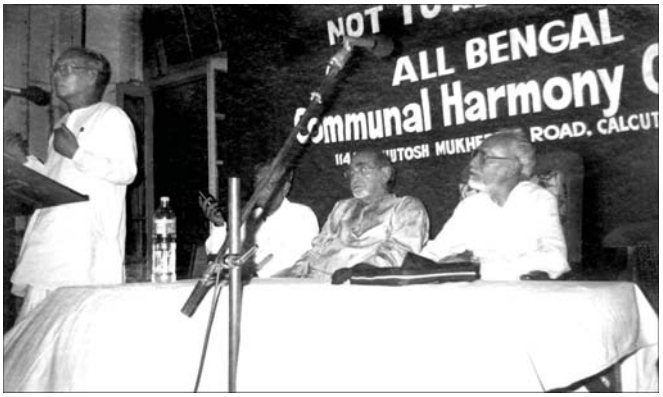

৮ মে কলকাতার স্টুডেন্টস হলের সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) মানিক মুখার্জী, আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার, ও গীতেশ শর্মা।

(নীচে) উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর একাংশ

মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা আজও মানুষকে বোঝাতে পারিনি কোন্‌টা তার বেশি প্রয়োজন — মন্দির-মসজিদ-গির্জা, নাকি স্কুল-হাসপাতাল-রাস্তাঘাট।

জননেতা মানিক মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, সম্প্রতি অযোধ্যা মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট খননকার্যের যে রায় দিয়েছে তা প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই হতবাক করে দিয়েছে। আজকে যে সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে, এই সভ্যতার তলায় তো অনেক কিছু ছিল। এই রায় মানলে তো বর্তমান সভ্যতাকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না, সব ভেঙেচুরে পুরনো অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হয়। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এইভাবে কি ইতিহাস বিচার করা যায় !

তিনি প্রশ্ন তোলেন, এদেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ধর্মীয় বিভেদের জন্ম দিয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসক, আন্দোলন করে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া গেল, কিন্তু আন্দোলন করে ধর্মীয় বিভেদ দূর করা গেল না কেন ? মানিকবাবু বলেন, এখানেই তথাকথিত বাম রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। আসলে স্বাধীনতার পর যাঁরা ক্ষমতায় এলেন, তাঁদেরও দরকার ছিল এদেশের মানুষকে শোষণ করার ; তাই ভেদাভেদ দূর করার কোনও চেষ্টা তাঁরা করেননি। স্বাধীনতা আন্দোলনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনটা হয়ই নি। বামপন্থীদের উচিত ছিল এটা শুরু করা। এটা তারা এড়িয়ে গেছে। আজ আমাদের তার মূল্য দিতে হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা আমাদের বিবেক-মনুষ্যত্বকে প্রতিনিয়ত খুন করছে এবং আজ বিচার বিভাগ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী নোংরা রাজনীতির পক্ষে রায় দিচ্ছে।

ফলে সামাজিক আন্দোলনের দ্বারা মানুষকে সচেতন করতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ঐক্যের আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, ধর্মকে যারা রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে মানুষের সামগ্রিক উন্নতির জন্য।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন — মানুষের মধ্যে সমস্ত মানবিকতা বর্জিত যত রকম পাশবিকতা হয়, তা একজায়গায় হলে কী হয়, তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। সেইটের নামই হচ্ছে কম্যুনালিজম। একদল এসে বলছে তুমি কোন্ ধর্মের লোক ? অন্য ধর্মের হলে তুমি আমাদের শত্রু এবং শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তিনি বলেন বাবরি মসজিদ নিপুণভাবে ভাঙা ও ধ্বংসস্তূপ দ্রুত সরিয়ে ফেলার কাজটাও করা হয়েছিল পূর্বপরিকল্পিতভাবে। এর সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং, বিজেপি নেত্রী উমা ভারতী এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল সকলেই জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের সকলকেই ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

সাংবাদিক-সাহিত্যিক গীতেশ শর্মা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে উদাহরণ সহযোগে দেখান যে, গোটা ভারতবর্ষই আজ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের শিকার হয়ে পড়ছে। দুঃখের সঙ্গে তিনি বলেন, যে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ অনেক গভীরে প্রোথিত ছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গেও আজ বিভিন্ন ধর্মের দিতে চাইছে, তাকে যেন গ্রহণ না করেন। তা করলে সমস্যা দূর তো হবেই না, বরং গোটা দেশের ক্ষতি হবে।

সাম্রাজ্যবাদ, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে স্ট্যালিন

[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৫১ সালে প্রাভদা পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনমুখী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাম্রাজ্যবাদ, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে কমরেড স্ট্যালিন যে বক্তব্য রেখেছিলেন, বর্তমানেও তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সেই কারণে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া স্ট্যালিন রচনাবলীর রুশ সংস্করণের ১৬শ খন্ড থেকে অনূদিত সাক্ষাৎকারটি ছাপা হল। অনুবাদের ত্রুটিবিচ্যুতির দায় আমাদের। — সম্পাদক গণদাবী]

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি হাউস অব কমন্সে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি বলেছেন — যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও সোভিয়েট ইউনিয়ন তার অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস করেনি, নিজের ফৌজও ভেঙে দেয়নি। তিনি একথাও বলেছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সামরিক শক্তি আরও বাড়াচ্ছে।

স্ট্যালিন ঃ আমি মনে করি, প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির এই বক্তব্য সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে কুৎসা ছাড়া কিছু নয়।

গোটা দুনিয়া জানে, যুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন তার ফৌজ ভেঙে দিয়েছে। একথাও সকলেই জানে, কাজটা তিন দফায় করা হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় দফায় কাজ হয়েছে ১৯৪৫ সালে, তৃতীয় দফায় কাজ হয়েছে ১৯৪৬ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে। তাছাড়াও ১৯৪৬ ও '৪৭ সালে সোভিয়েট সেনাবাহিনীর পার্সোনেল বিভাগ থেকে বয়স্কদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালের শুরুতে অন্যসব বিভাগ থেকেও বয়স্কদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

এ-সব কথাই সকলের জানা। যদি আর্থিক নীতি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের গভীর উপলব্ধি প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির থাকে তবে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন — সমস্ত অসামরিক শিল্পগুলিকে সর্বশক্তি দিয়ে গড়ে তোলা এবং ভোল্‌গা, দ্নীপার, আমু দরিয়ার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মতো বিশাল বিশাল নির্মাণকার্য করতে সরকারি বাজেটে শত শত কোটি রুবল বরাদ্দ করতে হয়; জনগণের ব্যবহার্য পণ্যের দাম ক্রমাগত কমানোর নীতি কার্যকর করতেও শত শত কোটি রুবল বাজেট বরাদ্দ দরকার, এছাড়াও জার্মান দখলদাররা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির যে বিরাট ক্ষতি করেছে তা মেরামত করে পুনর্গঠিত করতেও শত শত কোটি রুবল দরকার; এগুলো করতে করতেই সামরিক শক্তি বাড়ানো, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কলকারখানার সংখ্যা বাড়ানো কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষেও নয়। এমন বিবেচনাহীন নীতি নিয়ে চললে রাষ্ট্রকে দেউলিয়া হওয়ার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্যই জানা আছে যে, দেশের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা কেবল সমরশিল্প বাড়ায় কিন্তু অসামরিক শিল্প মার খায়। এর ফলে বৃহৎ অসামরিক নির্মাণকার্য স্থগিত হয়ে যায়, জনগণের ওপর করের বোঝা বাড়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বাড়ে। এ-কথাও পরিষ্কার যে, সুবিশাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা ও সেচ ব্যবস্থা প্রসারণের কাজ সোভিয়েট ইউনিয়ন কমাচ্ছে তো না-ই বরং বাড়াচ্ছে, তাছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত কমানোর নীতি সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্যাগ করেনি, বরং সেই নীতিই অনুসরণ করছে। এইসব কর্মসূচি রূপায়িত করার সাথে সাথে একই সঙ্গে দেউলিয়া হবার ঝুঁকি এড়িয়ে অস্ত্রনির্মাণ শিল্পের কলেবর বৃদ্ধি করা এবং সামরিক শক্তি বাড়ানো সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে সম্ভব নয়। এ-সব তথ্য ও বৈজ্ঞানিক ধারণার কোন তোয়াক্কা না করে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি যদি এই কথা বলে থাকেন, তাহলে তা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার শান্তির নীতির বিরুদ্ধে কুৎসা বলেই ধরতে হবে; বুঝতে হবে তিনি মনে করছেন, ইংল্যাণ্ড যে সমরসজ্জার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে তা যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করা যাবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির প্রয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তির নীতিকে আগ্রাসী নীতি এবং ব্রিটিশ সরকারের আগ্রাসী নীতিকে শান্তির নীতি বলে দেখানোর জন্য তাদের এটা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপন্থী চক্র যে নতুন একটা বিশ্বযুদ্ধের চক্রান্ত করছে, সে সম্পর্কে ব্রিটিশ জনগণকে বিভ্রান্ত করে সেই যুদ্ধের কানাগলিতে ব্রিটেনকে ঠেলে দেওয়ার জন্যও তারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি বলে থাকেন, তিনি শান্তির পক্ষে। তাই যদি হয় তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, চীন ও ফ্রান্সকে নিয়ে অবিলম্বে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রসংঘে তোলা সোভিয়েট প্রস্তাবকে তিনি খারিজ করলেন কেন?

যদি সত্যিই তিনি শান্তি চান তবে তিনি কেন অবিলম্বে অস্ত্রসজ্জা কমানোর এবং পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করার সোভিয়েট প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন?

যদি সত্যই শান্তির পক্ষে তিনি থাকেন, তাহলে আজ যারা যথার্থই বিশ্বশান্তি রক্ষা করতে চায়, তিনি তাদের বিরুদ্ধতা করছেন কেন? কেন ইংল্যাণ্ডে শান্তির শক্তিগুলির কংগ্রেস করতে তিনি বাধা দিলেন?

এ-থেকেই পরিষ্কার, প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি শান্তি চান না, নতুন এক আগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধই তিনি চান।

প্রশ্ন ঃ কোরিয়ায় হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আপনার মত কি? কী করে এই আগ্রাসন থামানো সম্ভব?

স্ট্যালিন ঃ যদি চীন সরকারের দেওয়া শান্তি প্রস্তাব ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষপর্যন্ত মেনে নেয় তবে আক্রমণকারীদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর সেনাপতি ও অফিসাররা ক্ষমতা ও দক্ষতায় চীন বা কোরিয়ার সেনাপতিদের চেয়ে খাটো — এটা কেন হয়?

স্ট্যালিন ঃ না, তাঁরা মোটেই খাটো নন। ব্রিটিশ ও মার্কিন সেনাপতিরা অপর কোন দেশের সেনাপতিদের চেয়ে খাটো নন। আমার মনে হয়, জার্মানির হিটলারবাহিনী বা জাপানি সমরচক্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা, মিত্রপক্ষের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের পাশে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। তাহলে, আজ তাঁরা তা পারছেন না কেন? কারণ, হিটলারবাহিনী ও জাপানি সমরচক্রের বিরুদ্ধে লড়াই তাঁদের কাছে যেমন ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ ছিল, চীন বা কোরিয়ার যুদ্ধ তা নয়। একে তাঁরা অন্যায় যুদ্ধ মনে করছেন। মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা এই যুদ্ধে একেবারেই মন থেকে সায় দিতে পারছেন না।

বাস্তবে, যে চীন, আমেরিকা বা ব্রিটেন কাউকেই হুমকি দিচ্ছে না; সেই চীনের কাছ থেকে তাইওয়ান দ্বীপ আমেরিকা জোর করে কেড়ে নিয়েছে। অথচ সেই চীন হল আক্রমণকারী; আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে তাইওয়ান দখল করেছে এবং চীন সীমান্ত বরাবর সেনা মোতায়েন করেছে, সেই আমেরিকা আত্মরক্ষা করছে — এ-কথা তারা ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদের বিশ্বাস করাতে পারছে না। চীনের সীমানায় বা কোরিয়ার জমিতে মোতায়েন মার্কিন সেনাদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে অথচ নিজের দেশের মাটিতে, নিজের সীমানায় দাঁড়িয়ে কোরিয়া বা চীনের সেই অধিকার নেই — এটা ইঙ্গ-মার্কিন সেনাদের বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণেই ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা এই যুদ্ধকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

এটা বুঝতে হবে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছে যে সেনারা তারা যদি দৃঢ়ভাবে মনে করে যে যুদ্ধটা অন্যায় যুদ্ধ, যদি তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে আস্থাহীন হয়, মনপ্রাণ ঢেলে না লড়ে, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তারা নিয়মরক্ষার খাতিরে গতানুগতিকভাবে কর্তব্যটুকু সারে — তবে বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সেনাপতি ও অফিসারদেরও পরাজিত হতে হয়।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রসংঘ যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে আগ্রাসনকারী বলে সিদ্ধান্ত করেছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

স্ট্যালিন ঃ আমার মনে হয় এটা একটা নিন্দনীয় সিদ্ধান্ত। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন ভূখণ্ডের অংশ তাইওয়ান দ্বীপপুঞ্জ দখল করে রয়েছে, কোরিয়ায় সামরিক অভিযান চালিয়ে চীন সীমান্ত পর্যন্ত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসে গিয়েছে — তারা আত্মরক্ষার জন্য লড়ছে, আর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, যে নিজের সীমান্ত রক্ষা করছে এবং মার্কিন দখলদারী থেকে তাইওয়ান ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে তারা আক্রমণকারী, ন্যূনতম ন্যায়বোধ বিসর্জন না দিলে এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না।

বিশ্বশান্তি রক্ষার দুর্গ হিসাবে গড়ে তোলা রাষ্ট্রসংঘ এখন যুদ্ধ বাধাবার হাতিয়ারে, নতুন বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার মঞ্চে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে আগ্রাসনের ঘাঁটি হচ্ছে — ন্যাটো সদস্যভুক্ত দশটি দেশ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, কানাডা, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, লুকসেমবার্গ, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও আইসল্যাণ্ড) এবং ল্যাটিন আমেরিকার কুড়িটি দেশ (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, কিউবা, ডমিনিকান রিপাবলিক, ইকোয়েডোর, সালভাদোর, গুয়াতেমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা)। এইসব দেশগুলির প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রসংঘে সিদ্ধান্ত করে যুদ্ধ হবে, না শান্তি থাকবে। এরাই রাষ্ট্রসংঘে বসে সিদ্ধান্ত করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন হল আগ্রাসনকারী।

বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের চেহারাটা এমনই যে, ডোমিনিকান রিপাবলিক বড় জোর ২০ লক্ষ লোকের দেশ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘে তার ক্ষমতা ভারতের সমান এবং চীনের মত বিশাল দেশের চেয়েও বেশি। রাষ্ট্রসংঘে চীনের ভোটাধিকারই নেই।

কাজেই রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধ বাধাবার মঞ্চে পরিণত হয়েছে, সকল দেশের সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার মর্যাদা সে খুইয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের কার্যকলাপের মর্মবস্তু বিচার করলে দেখা যাবে এটি আজ আন্তর্জাতিক সংগঠন ততটা নয়, বরং বহুলাংশেই তা আগ্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠন, তার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত সংগঠন। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, ল্যাটিন আমেরিকার বাইশটি দেশের ভূস্বামী ও ব্যবসাদাররাও চাইছে ইউরোপ বা এশিয়ার কোথাও যুদ্ধ লাগুক। তাহলেই তারা আতঙ্কিত দেশগুলিকে চড়া দামে পণ্যদ্রব্য বেচতে পারবে এবং রক্তাক্ত পথে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করবে। এ-কথা আজ আর কারো কাছে গোপন নেই যে, ল্যাটিন আমেরিকার বাইশটি দেশের মধ্যে বিশটির প্রতিনিধিই রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত লেজুড়।

এইভাবে, রাষ্ট্রসংঘ আজ লীগ অব নেশনসের মতো অমর্যাদাকর পথ ধরেছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রসংঘ তার নৈতিক কর্তৃত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছে এবং নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে।

প্রশ্ন ঃ আবার একটা বিশ্বযুদ্ধ কি অনিবার্য?

স্ট্যালিন ঃ না, চূড়ান্ত বিচারে বর্তমান অবস্থায় এটা অনিবার্য মনে হয় না। অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড এবং সেই সাথে ফ্রান্সের মধ্যেও আগ্রাসী যুদ্ধবাজ শক্তি আছে যারা নতুন একটা যুদ্ধ চায়। সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে, পররাজ্য গ্রাস করার স্বার্থে এদের যুদ্ধ দরকার। এরা হল লক্ষপতি, কোটিপতির দল। যুদ্ধকে এরা পয়সা কামানোর রাস্তা ও বিপুল মুনাফা লোটার সুযোগ বলে মনে করে।

এই যুদ্ধবাজগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিকে মদত দেয়, তাদের চালায়। কিন্তু একই সাথে তারা নিজ

পাঁচের পাতায় দেখুন

পরিবহনমন্ত্রীর চক্ষুলজ্জারও বালাই নেই

তেলের দাম গত এক মাসে তিন বারে প্রায় তিন টাকা কমলেও সরকার গতবারের বর্ধিত ভাড়া এখনও প্রত্যাহার করেনি। প্রতিবারই তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে পরিবহন মালিকরা কিছু বলার আগেই পরিবহনমন্ত্রী আগ বাড়িয়ে ভাড়া বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। এবং অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্ধিত ভাড়া ঘোষণা করেন। সর্বশেষ ভাড়াবৃদ্ধির সময়েও তাই করেছিলেন। আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা তখনই ভাড়াবৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলাম, 'ডিজেলের দাম কিছু বাড়ছে বলেই বাস মালিকদের লোকসান হবে এবং ভাড়া বাড়াতে হবে, এই বক্তব্য একেবারেই সত্য নয়। ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ফলে বড়জোর তাদের লাভের পরিমাণ কিছু কমতে পারে, কিন্তু লোকসানের কোন প্রশ্ন নেই।' (২৪ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের চিঠি)। ঐ চিঠিতে আমরা আরও দাবি করেছিলাম, 'সকল রাজনৈতিক দল, যাত্রী কমিটিগুলির প্রতিনিধি ও এ ব্যপারে বিশেষজ্ঞ এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে বাস মালিকদের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করতে হবে।' এবং 'বাসমালিকরা যাতে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং বাস-শ্রমিকদের দাবিগুলি মানে সরকারকে সেটা দেখতে হবে।' গত মাসে ভাড়া বাড়ানোর সময়ে পরিবহনমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে, তেলের দাম ওঠানামার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাড়ার হার নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। পরিবহনমন্ত্রী উপরোক্ত দাবিগুলি যেমন মানেননি, তেমনি এই বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেননি। এবার পেট্রল-ডিজেলের দাম কমার সাথে সাথে যখন স্বাভাবিকভাবে ভাড়া কমানোর দাবি উঠল, তখন সাততাড়াতাড়ি কারও সাথে কোন আলোচনা না করেই, সংবাদমাধ্যমে কোন ঘোষণা ছাড়াই রাজ্য সরকারের এক পুরনো আমলা, প্রাক্তন মুখ্যসচিব তরুণ দত্তকে দিয়ে এক সদস্যের একটি কমিটি তিনি গঠন করে দিলেন। প্রথমত, প্রাক্তন এই সচিব পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ নন। দ্বিতীয়ত, এই কমিটিতে যাত্রী কমিটিগুলির প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের রাখা হয়নি। তৃতীয়ত, প্রাক্তন এই আমলার বিচার্য বিষয় কী হবে তাও কিছু ঘোষণা করা হয়নি। ফলে, এই কমিটি হবে একটা লোকদেখানো কমিটি এবং সরকারি সুপারিশের ভিত্তিতেই তার রিপোর্ট তৈরি হবে। এমনিতেই মালিকশ্রেণীর সাথে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকারের যে ঘনিষ্ঠতা ও বোঝাপড়া ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, বিশেষ করে পরিবহনমন্ত্রীর তো এ ব্যাপারে চক্ষুলজ্জারও কোন বালাই নেই, সেখানে এই কমিটির সুপারিশ যে মূলত মালিকদের পক্ষেই যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আসলে রাজ্য সরকারের একজন অনুগত আমলাকে দিয়ে সময়ে সময়ে ভাড়াবৃদ্ধিকে গ্রহণযোগ্য করিয়ে নেওয়ার জন্যই এই কমিটি গঠন।

তেলের দাম তিন দফায় তিন টাকা কমার পর যখন রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষ পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে সর্বস্তরে ভাড়া কমানোর দাবি তুলছেন, এমনকি, শাসকদলের অভ্যন্তরে, সমর্থকদের মধ্যেও এই দাবি জোরদার হচ্ছে (গণশক্তিতে প্রকাশিত চিঠি, ২২/৫/০৩) এবং জনগণের এই দাবির চাপে সরকার পর্যুদস্ত হচ্ছে তখন সরকারি প্রশ্রয়পুষ্ট বাস মালিকরা হুমকি দিচ্ছেন, ভাড়া কমালে বাস বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, তেলের দাম কমলেও যন্ত্রাংশ সহ অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়েছে, লাইসেন্স ফি সহ অন্যান্য সরকারি ট্যাক্স বেড়েছে, ফলে ভাড়া কমানো চলবে না। সকলেই জানেন, সরকারের এই ট্যাক্স বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করে আমরা তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু সকলেই লক্ষ্য করেছেন তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াবৃদ্ধির যে দাবি মালিকরা তোলেন, এমনকি বাস বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেন, যন্ত্রাংশের দামবৃদ্ধির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ যন্ত্রাংশের দাম একই সঙ্গে লাফ দিয়ে বাড়েনা, সেটা বাড়ে তার নিয়মে। কিন্তু যন্ত্রাংশের দামবৃদ্ধির জন্য মালিকরা আলাদা করে ভাড়াবৃদ্ধির প্রশ্ন কখনও তোলেননা। এর অর্থ হচ্ছে, যে হারে তারা ভাড়া নেন, তাতে যন্ত্রাংশের দাম বাড়লেও তাদের লাভ ভালই হয়। যদি যন্ত্রাংশের দামবৃদ্ধির জন্য তাদের লোকসান হত, তাহলে ভাড়াবৃদ্ধির দাবি তোলার জন্য তারা তেলের দাম বাড়ার অপেক্ষা করতেন না। এর থেকে কি প্রমাণ হয় না যে অন্যায়ভাবে বিপুলহারে ভাড়া বাড়ানোকে জনমানসে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্যই তারা যেমন যন্ত্রাংশের দামবৃদ্ধির প্রশ্ন তুলতে থাকেন, তেমনি আজ ভাড়া কমানোর দাবির সময়েও এই কুট যুক্তি তুলে বাড়তি লাভ বহাল রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, জনস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে, রাজ্য সরকারের স্বার্থও আজ মালিকশ্রেণীর স্বার্থের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে।

গত ২০০২ সালের আগস্ট মাসে চলতি ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত ১৫% ভাড়া বাড়ানোর সময়ে জনগণকে ঠকানোর জন্য পরিবহন-মন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন এই বর্ধিত ভাড়ার ৯ শতাংশ মালিকরা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করবেন। সকলেই জানেন, মালিকরা এ বাবদ একটি পয়সাও খরচ করেনি। সবই তাদের ব্যাঙ্কে গিয়ে জমেছে।

সম্প্রতি পরিবহনমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, ১ জুন থেকে পরিবহনের ভাড়া কমানো হবে। আবার কয়েকদিন পরেই তিনি বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের নিষেধাজ্ঞার জন্য নাকি ২২ জুন পর্যন্ত ভাড়া কমানো যাবে না। অদ্ভুত যুক্তি ! ভোট থাকা সত্ত্বেও যদি ডিজেল-পেট্রলের দাম কমতে পারেন, তাহলে বাসের ভাড়া কমাতে পারা যাবেনা কেন ? অর্থাৎ তেলের দাম কমলেও সরকারি সৌজন্যে বর্ধিত ভাড়ার দৌলতে দরিদ্র জনগণের পকেট কেটে মালিকরা বাড়তি মুনাফা করতেই থাকবেন। যে কোন প্রকারে মালিকদের বর্ধিত ভাড়া পাইয়ে দেওয়ার চাতুরি ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে। আর ইতিমধ্যে যদি তেলের দাম কোনভাবে একটু বেড়ে যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা — কমানোর প্রসঙ্গই আর উঠবে না। পরিবহনমন্ত্রী কি এ প্রতিশ্রুতি দেবেন যে, যেদিন থেকে তেলের দাম কমেছে সেদিন থেকে যাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া বাড়তি ভাড়া পুরোপুরি মালিকরা ফেরত দেবেন এবং তা যাত্রী কল্যাণে আলাদা তহবিল গঠন করে খরচ করা হবে। না হলে অন্যায়ভাবে আরও কিছুদিন এই বাড়তি ভাড়া নেওয়ার কী অধিকার মালিকদের আছে ?

প্রকাশিত সংবাদে জানা গেল, প্রতি ধাপে ২৫ পয়সা করে ভাড়া কমানোর কথা পরিবহনমন্ত্রী বলেছেন। কেন ? তেলের দাম বৃদ্ধিকে অজুহাত করে ভাড়া বাড়ানোর সময়ে ২৫ পয়সা করে ভাড়া বাড়ানোর কথা পরিবহনমন্ত্রী কখনো ভেবেছেন কি? এপ্রিল মাসে ভাড়া বৃদ্ধির সময়ে প্রথম ধাপে এক টাকা, পরবর্তী ধাপে কোথাও ৫০ পয়সা, কোথাও এক টাকা বা তারও বেশি ভাড়া বাড়িয়েছেন। তাহলে কমানোর সময়ে মাত্র ২৫ পয়সা কেন !

সাধারণ মানুষ যাতে সংগঠিত আকারে ভাড়া কমানোর দাবিতে আন্দোলনে সামিল হতে না পারে — সেই লক্ষ্যেই নাম কা ওয়াস্তে ২৫ পয়সা ভাড়া কমানোর কথা বলে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। একথা আজ কারও অবিদিত নেই যে, সিপিএম সরকারের খেয়ালখুশিমতো পরিবহনের ভাড়া বাড়ানোর নীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই দল লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। দলের পক্ষ থেকে বারেবারেই ভাড়া সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। দলের লাগাতার আন্দোলন ও প্রচারের ফলেই বামপন্থার মুখোসধারী সরকারের মালিকতোষণ নীতি নগ্ন হয়ে পড়ছে এবং সাধারণ মানুষ ভাড়া কমানোর দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন।

তেলের দামবৃদ্ধিকে অজুহাত করে যদি পরিবহনের ভাড়া বাড়ানো হয়, তবে তেলের দাম কমলেও ভাড়া কমাতে হবে — সাধারণ মানুষের এই ন্যায়সঙ্গত দাবিটিকেও মেনে নিতে রাজ্য সরকারের যে টালবাহানা — তা প্রমাণ করে অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত দাবির মতোই ভাড়া কমানোর দাবিটিকেও রাজ্য সরকারকে মানাতে বাধ্য করতে হবে। আজ আর শুধু সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে হবে না, সাধারণ মানুষকেও সংগঠিতভাবে আন্দোলনে সামিল হতে হবে। এই জন্যই দাবি জানানোর পাশাপাশি আমরা দলের পক্ষ থেকে লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছি।

জেলায় জেলায় অবরোধ

একের পাতার পর

পুরুলিয়া শহরে অবরোধ ভাঙতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ২৪জনকে গ্রেপ্তার করে। এই জেলারই রঘুনাথপুর, হুড়া, সান্তালডিতে পথ অবরোধ হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার নেতাজী মোড়ে, লালবাগের আস্তাবল মোড়ে এক ঘন্টা অবরোধ চলে। জঙ্গিপুর, রানীনগর, ইসলামপুর, হরিহরপাড়ায় বিকালে অবরোধ হয়। সুতিতে অবরোধকারীদের ওপর সি পি এম ঠ্যাঙাড়েবাহিনী হামলা করে। রানীনগরে পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার ও মাইক বাজেয়াপ্ত করেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, নামখানায় পথ অবরোধ হয়।

হাওড়ার বঙ্গবাসী মোড়ে অবরোধ হয় এবং স্টেশন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে আন্দোলনের দাবিগুলি তুলে ধরা হয়।

মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম দুই জেলারই নানা স্থানে এস ইউ সি আই কর্মীরা ও বিক্ষুব্ধ জনতা পথ অবরোধ করে। কাঁথির সেন্ট্রাল বাস স্ট্যাণ্ড, ঝাড়গ্রামের নেতাজী মার্কেট, মেদিনীপুর শহরের সিপাইবাজারে বিক্ষোভ প্রদর্শন, মেছোদায় থার্মাল গেট মোড়ে পথ অবরোধ হয়।

বীরভূম জেলার সিউড়ি বাসস্ট্যাণ্ডে একঘন্টা অবরোধ চলার পর পুলিশ হস্তক্ষেপ করে।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের তুফানগঞ্জে জাতীয় সড়কে অবরোধ ভাঙতে পুলিশ লাঠি চালায় ও ৫ জন মহিলা সহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। কোচবিহার টাউনে এক ঘন্টা অবরোধ চলে। ঘুঘুমারি ও হলদিবাড়িতে পথ অবরোধ হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে পুলিশ অবরোধকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে।

জলপাইগুড়ি জেলার কদমতলায় পথ অবরোধ হয়। এই

গাইঘাটায় পুলিশের লাঠিচার্জে আহত কমরেড স্বপন গোস্বামী

জেলায় নিত্যবাসযাত্রী সমিতির আন্দোলনের চাপে জেলা প্রশাসন বাসভাড়া বেশ কিছুটা কমিয়ে নোটিফিকেশন জারি করে। এর বিরুদ্ধে বাসমালিকরা আচমকা বাস ধর্মঘট ও পথ অবরোধ করে। এদের চাপে প্রশাসন ভাড়া পুনর্নির্ধারণের কাজ সাত দিন পিছিয়ে দিলে তার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন শুরু হয়েছে।

দার্জিলিং জেলার কাছারির মোড়ে পথ অবরোধ করা হয়। সাধারণ যাত্রীরা আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সমর্থন জানান। ভাড়া কমানোর দাবিতে এ ডি এম-এর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

অন্যায় অযৌক্তিক বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার ছাড়াও এদিনের বিক্ষোভের দাবি ছিল — এতদিন আদায় করা বাড়তি ভাড়া ফেরৎ নিয়ে সরকার ও যাত্রী কমিটির যৌথ নিয়ন্ত্রণে যাত্রী কল্যাণ তহবিল খুলতে হবে। যাত্রী নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। ডিজেলের ওপর থেকে সেস তুলে নিতে হবে। বাস কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী চাকুরি, ন্যায্য মজুরি ও জীবন বীমার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ধিত লাইসেন্স ফি প্রত্যাহার করতে হবে।

স্ট্যালিন ও ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম

ব্রাসেলস্ সেমিনারে এস ইউ সি আই

বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে গত ২ থেকে ৪ মে, ২০০৩ দ্বাদশ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার সহ ৪৫টি দেশের ৭২টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলগুলি যে সমস্ত বিষয়ের উপর পেপার পাঠ করে এবং তার ওপর আলোচনা করে — সেই বিষয়গুলি হল ঃ (১) ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পরবর্তী সময়ে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধনীতির বিশ্লেষণ, (২) ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধ, স্ট্যালিন ও কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন (বলশেভিক)-এর ভূমিকা — আজকের জন্য শিক্ষা, (৩) যুদ্ধের সম্ভাবনার সামনে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ও কৌশলগত কর্তব্য, (৪) সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী ফ্রন্টে পার্টির কাজের অভিজ্ঞতা।

মূল সেমিনারে আমাদের দলের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী উল্লিখিত দ্বিতীয় বিষয়টির উপর একটি পেপার পড়েন — পেপারটির শিরোনামা হল "স্ট্যালিন ও ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম।" স্থান সঙ্কুলানের জন্য পেপারটিকে সামান্য সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে প্রকাশ করা হল।

সেমিনারের পর ৫ মে সকালে গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার প্রতি সংহতিজ্ঞাপনের জন্য ইউরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ঐ সম্মেলনে অবজার্ভার হিসাবে অংশগ্রহণ করে উত্তর কোরিয়ার সরকার ও জনগণের প্রতি দলের পক্ষ থেকে সংহতি জ্ঞাপন করেন।

স্ট্যালিন ও ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর কেটে গিয়েছে। সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে মিলে আমাদের দল, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইণ্ডিয়া অগাধ ভালবাসা আর শ্রদ্ধার সাথে স্ট্যালিনকে স্মরণে রেখেছে। যে সমস্ত প্রগতিশীল ও বিপ্লবী ঐতিহ্য, উদ্দীপনা আর সংগ্রামী চেতনা আজও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামগুলিকে অনুপ্রেরণা জোগায় — তাদের অনেকগুলিরই উৎস স্ট্যালিন। বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় স্ট্যালিন এমন এক অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত যে, তার চরম শত্রুর পক্ষেও তাঁকে একেবারে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর তাই সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের মন থেকে তাঁর স্মৃতিকে মুছে দেওয়ার জন্য অবিরাম কুৎসা প্রচার করে গিয়েছে।

স্ট্যালিনের কৃতিত্ব বহুমুখী। আমি এখানে কেবল একটি বিষয়ের মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব — তা হল, ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে স্ট্যালিন ও সি পি এস ইউ-এর ভূমিকা।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সদ্যগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশের ভিতরের ও বাইরের প্রতিক্রিয়াশীলরা যে সমস্ত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের ছক কষেছিল, প্ররোচনা যুগিয়েছিল ও বাস্তবে রূপ দিয়েছিল, তার সবকটিকেই সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন সোভিয়েত বিপ্লবের মহান নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। তিনি যে কেবলমাত্র সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিলেন, লালনপালন করেছিলেন তাই নয়; তাকে একটা শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। লেনিনের ছিল এক নতুন শিল্পসমৃদ্ধ রাশিয়া গড়ে তোলার সোনালী স্বপ্ন। মাত্র ষোল বছর সময়ের মধ্যে স্ট্যালিন লেনিনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। কাজটা ছিল পর্বতপ্রমাণ এবং স্ট্যালিন তা সম্পন্নও করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। দুর্ভিক্ষ অতীতের দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। বিরাট বিরাট আধুনিক শিল্পগুলি মাথা উঁচু করে গড়ে উঠেছিল। বিস্তীর্ণ তুষার ঢাকা জনশূন্য প্রান্তরগুলিতে গড়ে উঠেছিল জনবহুল শিল্পনগরী। সাইবেরিয়া একদিন ছিল নির্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট বিভীষিকাময় দুর্গম অঞ্চল। তা এমনভাবে পাল্টে গিয়েছিল যে তাকে চেনাই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন ঘটে চলেছিল গোটা দেশ জুড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন এইসব ঘটে চলেছে, জার্মানিতে তখন ফ্যাসিবাদের কুৎসিত মুখ দেখা দিচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা এবং তার সাথে ঐ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে জার্মান জাতির মধ্যে এক আহত জাতীয় মর্যাদাবোধ হিটলারের ক্ষমতায় আসার পথ তৈরি করে দিয়েছিল। হিটলারের রাজনৈতিক মতাদর্শের দুই বাহু ছিল ইহুদি বিদ্বেষ এবং বলশেভিকবাদ বিরোধিতা। জার্মানির পুঁজিপতিশ্রেণীও তার মধ্যে এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছিল যে কমিউনিজমের হাত থেকে তাদের স্বার্থকে রক্ষা করবে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি জার্মানির সামরিকীকরণকে খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখলেও, কমিউনিজম ভীতি থেকে তারাও হিটলারকে তোয়াজ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। হিটলারকে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক স্তম্ভ হিসাবে দেখেছিল এবং ধরে নিয়েছিল কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইটা হিটলার লড়ে দেবে। হিটলার নিজেও সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার পরিকল্পনার কথা আগাগোড়াই ব্যক্ত করেছিলেন। ... স্ট্যালিনও খুব ভালভাবেই জানতেন যে ফ্যাসিস্ট জার্মানির রণহুঙ্কার প্রধানত এবং শেষপর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই পরিচালিত হবে। এবং এই কাজে সে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের সমর্থন এবং সাহায্য পাবে।

সোভিয়েত রাশিয়া শিল্পায়ন ও কৃষির আধুনিকীকরণের দিকে দ্রুত এগোচ্ছিল। তার এইসব কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল দেশের জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি। ফলে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের গোড়ার বছরগুলিতে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং গোলাগুলি উৎপাদনের দিকে জোর দেওয়া হয়নি। কিন্তু ফ্যাসিজম যখন তার ভিত শক্ত করতে লাগল, স্ট্যালিনও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। শিল্পগুলিকে যন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণ করে যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্ক ও কামানের উৎপাদন বাড়ান হল। কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সাথে, তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়া সত্ত্বেও, তাদেরকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে এক 'যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা'-র মধ্যে নিয়ে আসার জন্য — লাগাতার আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলেন। কিন্তু ঐ দেশগুলি হিটলারকে তোয়াজ করে যেতে থাকে এবং হিটলারও অক্লান্তভাবে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের মনে করিয়ে দিতে থাকেন — কমিউনিজমের হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করার কাজে জার্মানি কি বিরাট ভূমিকা নিয়ে এসেছে।

১৯৩৯ সালে যখন যুদ্ধ বেধে গেল, হিটলার রাশিয়ার দিকে নজর দেওয়ার আগে প্রথম ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইলেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করতে চাইলেন এবং অত্যন্ত প্রাজ্ঞতার সাথে স্ট্যালিন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। হিটলারের উদ্দেশ্য নিয়ে স্ট্যালিনের কোন বিভ্রম ছিল না এবং এই চুক্তির সুবাদে যেটুকু সময় পাওয়া গেল, তাকে স্ট্যালিন যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য পুরোপুরি কাজে লাগালেন। আসন্ন যুদ্ধের সময় যাতে সামরিক সরবরাহ অব্যাহত থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে যুদ্ধাস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানো হল এবং জার্মান সেনাবাহিনী দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে এলে তাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রধান শিল্পগুলিকে উরাল পর্বতের ওপারে অর্থাৎ পূর্বদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

স্ট্যালিন জানতেন কেবলমাত্র আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী দিয়ে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাস্ত করা যাবে না। এই যুদ্ধ হবে গোটা জাতির যুদ্ধ। শিল্প, খনি, কৃষি —সমস্ত ক্ষেত্র থেকেই যুদ্ধের জন্য দিনের পর দিন সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। ফলে তার জন্য বিশেষ করে যা দরকার তা হল, জনগণের অদম্য মনোবল এবং এমন এক নেতৃত্ব, যা তাদের সামনে 'বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার বিজয় অনিবার্য' — এই সত্যের মূর্ত প্রতীকের মত বিরাজ করবে, যা তাদের সাহস, সংগ্রামী চেতনা আর লক্ষ্যে অবিচলতা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। সেদিন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সেদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গোটা দেশের জনগণকে এমনভাবে এবং এতদূর পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করেছিল, যা পৃথিবীতে কেউ কখনও দেখেনি। কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ — সমস্ত বয়সের ও সমস্ত স্তরের মানুষ এগিয়ে এসেছিল ভলান্টিয়ার হিসাবে। যুদ্ধের সময় নিয়মিত সামরিক বাহিনীর পিছনে এরা এক অদৃশ্য অফুরান বাহিনীর কাজ করে গিয়েছিল। ....

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হতেই, হিটলারের দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট বাহিনী বিনা বাধায় এবং অপ্রতিহতভাবে একের পর এক ইউরোপীয় দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে থাকে। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে হিটলার দেশে দেশে একদল দেশদ্রোহী আগেই তৈরি করে রেখেছিল, যারা আক্রান্ত দেশগুলির ভিতরে থেকে নাশকতা সংগঠিত করবে এবং নাৎসি বাহিনীর হয়ে কাজ করবে। জার্মান মিলিটারি ও রাজনৈতিক কম্যাণ্ড সোভিয়েত রাশিয়ার জন্যও সোভিয়েত আক্রমণের আগাম প্রস্তুতি হিসাবে এই ধরনের এক 'আভ্যন্তরীণ কাজ'-এর পরিকল্পনা করেছিল। স্ট্যালিন জানতেন যে এইসব কার্যকলাপকে গোড়াতেই যদি গুঁড়িয়ে না দেওয়া যায় এবং দেশদ্রোহীদের দেশ থেকে পুরোপুরি মুছে না দেওয়া যায়, তবে সোভিয়েত জাতি ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক মানুষের মতো দাঁড়াতে পারবে না।

ট্রটস্কি, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও বুখারিন প্রমুখ লেনিনবাদ বিরোধী গোষ্ঠীগুলির ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ ১৯৩৪ সালে কিরভ-হত্যার পর সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। অভিযুক্তদের সোভিয়েতের সুপ্রিম কোর্টে প্রকাশ্যে বিচার করা হয়; বিচারে তারা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রাশিয়ায় নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জোসেফ

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্ট্যালিনের সাক্ষাৎকার

তিনের পাতার পর

নিজ দেশের জনগণকে, যে জনগণ নতুন একটা যুদ্ধ চায় না, যে জনগণ শান্তির পক্ষে, সেই জনগণকে ভয় পায়। তাই যুদ্ধবাজ শক্তিগুলি প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে ব্যবহার করে মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে, ঠকিয়ে নতুন যুদ্ধকে আত্মরক্ষার লড়াই বলে দেখায় এবং শান্তিপ্রিয় দেশের শান্তির নীতিকে আগ্রাসী বলে চালাতে চায়। তারা নিজ নিজ দেশের জনগণকে ঠকিয়ে তাদের আগ্রাসী নীতি জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে ও তাদের নতুন একটা বিশ্বযুদ্ধের পক্ষে টেনে আনতে চায়।

তাদের ভয়, জনগণের আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলির আগ্রাসী পদক্ষেপের প্রকৃত চেহারা নগ্ন করে দেবে।

ঠিক এই কারণেই, তারা জনগণের শান্তি আন্দোলনকে ভয় পায়।

তাদের ভয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাব প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলির পদক্ষেপের আগ্রাসী চরিত্রকে প্রকাশ করে দেবে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা কর্মসূচি যে পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় তা দেখিয়ে দেবে।

ঠিক এই কারণেই, তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের তোলা ব্যাপক শান্তি চুক্তি সম্পাদন, নিরস্ত্রীকরণ, আণবিক অস্ত্র নির্মাণ রদের প্রস্তাব ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হল, আগ্রাসনের শক্তি ও শান্তির শক্তির মধ্যে এই সংঘাতের নিরসন হবে কী করে? শান্তি বজায় রাখা ও তা সুদৃঢ় করা একমাত্র তখনই সম্ভব, যদি জনগণ শান্তি সুরক্ষিত রাখাকে আপন কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং এ প্রশ্নের চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সেই কর্তব্যে অবিচল থাকে। আর যদি যুদ্ধবাজেরা মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা ব্যাপক জনগণকে বিভ্রান্ত করতে, তাদের ঠকাতে এবং নতুন একটা বিশ্বযুদ্ধের পক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হয় তবে নতুন একটা বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তাই, যুদ্ধবাজদের দস্যুবৃত্তির ষড়যন্ত্রের মুখোস খুলে দেওয়ার হাতিয়ার হিসাবে ব্যাপক জনগণকে জড়িত করে শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা আজ সবচেয়ে জরুরি।

সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ এবং আগামী দিনে যুদ্ধবিরোধী, শান্তি রক্ষার নীতিতে অবিচল থাকবে।

[প্রাভদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১]

স্ট্যালিন ও ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম

পাঁচের পাতার পর

ডেভিস সেসময় লিখেছিলেন, "বিচারপর্বে যে সব কাহিনী বিবৃত হয়, তাতে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ফিফ্‌থ কলামিস্ট ও একগুচ্ছ নাশকতামূলক কার্যকলাপের কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এইসব কার্যকলাপ ছিল জার্মান ও জাপান সরকারের সঙ্গে মিলে এক চমকপ্রদ ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। তারা (অভিযুক্তরা) স্ট্যালিন ও মলোটভকে হত্যা করার ও ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে এক মিলিটারি অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনায় রাজি হয়েছিল এবং বাস্তবে সেই কাজে সহযোগিতাও করছিল। .... যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে শিল্পে যেসব কাজ চলছিল তা সাবোটাজ করার, রাসায়নিক কারখানাগুলিকে উড়িয়ে দেওয়ার, কয়লাখনিগুলিকে ধ্বংস করার, পরিবহন ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার ও অন্যান্য নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালানোর ব্যাপারে তারা সম্মত হয়েছিল এবং বাস্তবে এই সমস্ত পরিকল্পনাও করেছিল, এমনকি তাতে নেতৃত্বও দিচ্ছিল।" ট্রটস্কিপন্থীদের সোভিয়েত বিরোধী এবং ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ বেশ কিছু বছর ধরে চলছিল। কিন্তু ১৯৩৪ সালের আগে তাদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানো হয়েছিল .... ১৯৩৪-এ কিরভ হত্যার পর অবস্থা পাল্টে যায়। ফ্যাসিস্ট জার্মানি ক্রমাগত শক্তি বাড়াচ্ছিল এবং সীমানার ওপার থেকে তাদের যুদ্ধ হুংকার ক্রমেই বেশি করে শোনা যাচ্ছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, যুদ্ধ সমাসন্ন এবং দেশের মধ্যে শত্রুর গুপ্তচরেরা সক্রিয়, যাদের যুদ্ধ বাধার আগেই নিশ্চিহ্ন করা দরকার। এই কাজটা ছিল খুব কঠিন, কারণ কাজটা অত্যন্ত জটিল এবং যা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করতে হবে। দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, আইনজীবী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী, শ্রমিক, চাষি এমনকি বেশ কয়েকজন বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত 'মস্কো ট্রায়াল'-এর প্রকাশ্য বিচারপর্ব উপযুক্তভাবেই প্রমাণ করেছিল যে দেশদ্রোহী ও চক্রান্তকারীদের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট দেশগুলি ও তাদের গুপ্তচর বাহিনীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং দলে এক বিরাট পার্জ বা শুদ্ধিকরণ অভিযান চালানো হয়েছিল। পরবর্তী ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে এই কাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জোসেফ ডেভিসের কথায়, "এই সমস্ত বিচার, পার্জ ও লিক্যুইডেশন সেইসময় অত্যন্ত ভয়াবহ বলে মনে হলেও এবং বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করে তুললেও, এখন বেশ পরিষ্কার যে এইগুলি ছিল স্ট্যালিন সরকারের এক জোরদার ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পদক্ষেপেরই অঙ্গ, যার দ্বারা তারা শুধু দেশের অভ্যন্তরে (প্রতি) বিপ্লবই নয়, দেশের বাইরে থেকে আক্রমণের হাত থেকেও নিজেদের রক্ষা করেছিল। তারা আদ্যোপান্তভাবে দেশের মধ্যেকার সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। .... ১৯৪১ সালে রাশিয়ায় কোন ফিফ্‌থ কলামিস্ট ছিল না — তাদের ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছিল। দলের অভ্যন্তরে পার্জ বা শুদ্ধিকরণ অভিযান দেশদ্রোহীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেছিল এবং ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।"...

সংশোধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী চক্র সেই সময়কার কিছু 'বাড়াবাড়ি'র উদাহরণ তুলে ধরে প্রমাণ করতে চায় যে, 'স্ট্যালিনের সন্ত্রাস' কত নিষ্ঠুর ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্ট্যালিন নিজেই এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়ে বলেছিলেন, "একথা অস্বীকার করা চলে না যে, দল থেকে ব্যাপকহারে বহিষ্কারের ক্ষেত্রে কিছু মারাত্মক ভুলভ্রান্তি ঘটেছে। দুর্ভাগ্যবশত যতটা ভুল হতে পারে বলে আশংকা করা গিয়েছিল, ভুল হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি। অবশ্যই আমাদের আর দ্বিতীয়বার এমন ব্যাপক পার্জের সাহায্য নিতে হবে না। যাই হোক, ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬-এর পার্জকে এড়ানো সম্ভব ছিল না এবং এর ফলাফল সামগ্রিকভাবে ভালই হয়েছিল।"

ইতিহাস প্রমাণ করেছে স্ট্যালিন শুধু সমাজতন্ত্রকেই রক্ষা করেননি, ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মানবসভ্যতাকেও বাঁচিয়েছিলেন। ... মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক ও আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, স্ট্যালিনকে বিচার করতে গেলে, তাঁকে বুঝতে গেলে সর্বহারা শ্রেণীচিন্তা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। তিনি বলেছেন, "বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠ কমরেডদের প্রতি চরম শাস্তি মঞ্জুর করা এবং তাঁদের মৃত্যুতে এতটুকু দুঃখিত না হওয়া — স্ট্যালিনের এই আপাত বিস্ময়কর আচরণটিকে বুঝব কীভাবে ? এর যথার্থ মূল্য বুঝতে পারা কোন মানবতাবাদীর পক্ষে সম্ভব নয়। একজন বিপ্লবীর কাছে বিপ্লবের প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বড়, আর সবকিছুই — যেমন ভালবাসা, মমত্ব, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বন্ধুত্ব — যা একজন মানবতাবাদীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত মূল্যবান, যা নিয়েই সে বেঁচে থাকতে পারে, একজন বিপ্লবীর কাছে এসবই বিপ্লবের চেয়ে গৌণ। বিপ্লবের প্রয়োজনে যদি ঘনিষ্ঠতম কমরেডেরও প্রাণদণ্ড দিতে হয় একজন যথার্থ বিপ্লবী অপার আনন্দের সঙ্গেই তা দিতে পারে।"

বুর্জোয়া দুনিয়ায় একটা চালু অভিযোগ আছে যে, স্ট্যালিন দমন ও সন্ত্রাস দিয়ে সোভিয়েত জনগণকে দাবিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু যে সত্যটা বুর্জোয়ারা আড়াল করে তা হল, জনগণের মধ্যে যদি বিক্ষোভ থেকে থাকত, তবে শান্তির সময়কার স্বাভাবিক অবস্থার কথা বাদ দিলেও, যুদ্ধের উত্তাল অশান্ত দিনগুলিতে আমলাতান্ত্রিক-প্রশাসনিক রাস্তায় জনগণের বিক্ষোভকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হত না, বিশেষ করে যখন বাল্টিক উপকূলের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে জার্মানরা তাদের দখল করা অঞ্চলে নিরন্তর এক প্ররোচনামূলক প্রচার শুরু করেছিল। জার্মান বাহিনীর দখলে রাশিয়ার যেসব অঞ্চল চলে গিয়েছিল সেইসব অঞ্চলের জনগণ কেন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে স্ট্যালিনের 'নিষ্ঠুরতা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় নি ? এই প্রশ্নের উত্তর সংশোধনবাদী নেতারা এড়িয়ে যান। অথচ জার্মান ফ্যাসিস্টরা ত এটাই আশা করেছিল। হিটলার ধরে নিয়েছিল যে, দেশ আক্রান্ত হলেই রাশিয়ায় রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটবে এবং প্রাথমিক অবস্থায় স্ট্যালিন যদি হারতে থাকেন তাহলে তাঁর দেশের মানুষই তাঁকে ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু স্ট্যালিনের উপর গোটা সোভিয়েত জনগণের অগাধ আস্থা ছিল। তিনি ছিলেন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-মনোবলের মূর্ত প্রতীক। তাঁরই নেতৃত্ব রাশিয়ার জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিল — যে অনুপ্রেরণা নিয়ে তারা জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে পিছন দিক থেকে গেরিলা বাহিনী হিসাবে নজিরবিহীন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে, প্রচুর আত্মত্যাগ করেছে এবং প্রাথমিক পরাজয় সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে লড়াই করে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে নিশ্চিতভাবে পরাভূত করেছে। .... স্ট্যালিনের নিজের কথায় "সোভিয়েত সরকারের প্রতি রাশিয়ার জনগণের আস্থাই মানবজাতির শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

স্ট্যালিন তাঁর সমসাময়িক দুনিয়াকে পাল্টাতে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক অবস্থান থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব, যেমন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, উপনিবেশগুলির জনগণের সাথে সেই সমস্ত দেশের শাসকদের দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সাথে সদ্য স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমস্ত দ্বন্দ্বকেই স্ট্যালিন দ্বন্দ্বতত্ত্বের এক গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি নিয়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের সময় স্ট্যালিন সাফল্যের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তুলেছেন, এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করে জার্মান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘোষিত শত্রু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকাকে সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে হাত মেলাতে বাধ্য করেছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হয়েই চার্চিল স্বীকার করেছিলেন যে, 'স্ট্যালিন আমাদের, অর্থাৎ যাদের তিনি সাম্রাজ্যবাদী বলেন, তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত করে দিয়েছিলেন'।

লালফৌজের বিজয় অভিযান এবং ফ্যাসিবাদের চূর্ণ হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। সোভিয়েত জনগণ ও লালফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও বিজয় সারা বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। চীন ও কোরিয়ায় বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সমান্তরাল এক সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে উঠেছিল। বেশিরভাগ উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলি স্বাধীন হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য আর রাজনৈতিক সমর্থন দিতে শুরু করেছিল, যার শক্তিতে তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী, শান্তির সপক্ষে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল। জন্ম নিয়েছিল নির্জোট আন্দোলন। স্ট্যালিন বিভিন্ন দ্বন্দ্বকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে পুঁজিপতিশ্রেণীর উপর প্রবল চাপ তৈরি করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছিল। নতুন নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল, বিশ্ব এসে দাঁড়িয়েছিল বিশ্ববিপ্লবের দোরগোড়ায়। এইসব কিছুর পিছনে স্ট্যালিন ও তাঁর নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ এক নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল।

স্ট্যালিন সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকেই আক্রমণের লক্ষ্য করেছিল ; তাদের এ কাজে সাহায্য করেছিল ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে এই সংশোধনবাদী নেতৃত্ব স্ট্যালিনের নেতৃত্বকারী ভূমিকাকেই খাটো করে দেয় এবং ডিস্ট্যালিনাইজেশন অর্থাৎ স্ট্যালিনের নাম মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করে। আদর্শগত বিভ্রান্তি সাম্যবাদী আন্দোলনকে ছেয়ে ফেলে। গুটিকয়েক পার্টি বাদে বিশ্বের বেশিরভাগ কমিউনিস্ট পার্টিই সি পি এস ইউ-এর বিংশতিতম কংগ্রেসে তোলা ব্যক্তিপূজার প্রচারে ভেসে যায় এবং স্ট্যালিনকে ছেড়ে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করে। স্ট্যালিনের ভূমিকাকে অস্বীকার করা মানে হল কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসকে বিকৃত করা ও তার দ্বারা কমিউনিস্ট চেতনাকেই ভোঁতা করে দেওয়া। স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ ঠিক এই কাজটাই করেছে, জনগণের চোখে কমিউনিস্ট আদর্শকে হেয় করেছে। সংশোধনবাদ ভিতর থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে দুর্বল করে দিয়েছে যা শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে।

এই বিপর্যয়ের মূল কারণ যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি ও নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, যা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে ছেয়ে রেখেছে। আদর্শগত চেতনার নিম্নমানের জন্যই এটা ঘটতে পেরেছে। স্ট্যালিনের জীবনের শেষদিকে তাঁকে ঘিরে ব্যক্তিপূজার সূত্রপাত অবশ্যই ঘটেছিল। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে এই ব্যক্তিপূজা কীভাবে জন্ম নিল সে সম্পর্কে আমাদের যদি সঠিক মার্ক্সবাদী উপলব্ধি না থাকে, তবে আমরা একে দূর করতে পারব না। পরিণামে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশই ব্যাহত হবে। কমরেড ঘোষ বলেছিলেন ঃ এ ঘটনা অস্বীকার করা যায় না যে, স্ট্যালিনকে জনগণের সামনে তুলে ধরে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল। স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ব, তাঁর নেতৃত্ব সাধারণভাবে গোটা রাশিয়ার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেইসঙ্গে আবার এই পথেই এসেছিল আদর্শগত মানের নিম্নগামিতা। জনগণের সামনে একজন নেতাকে তুলে ধরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রক্রিয়ার মধ্যেই যে যান্ত্রিকতা নিহিত রয়েছে, সেই যান্ত্রিকতাকে কমিউনিস্টদের এবং জনগণের আদর্শগত-সাংস্কৃতিক মান নিচু থেকে যাওয়ায় শেষপর্যন্ত দূর করা যায়নি। তাই স্ট্যালিনের রাশিয়া আজ সংশোধনবাদী পথে চলেছে।

কমরেড ঘোষ আরও বলেছিলেন যে, সার্বিক যৌথপ্রক্রিয়ার মধ্যে নেতার সঙ্গে বাকি সদস্যদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অভাবই দলে ব্যক্তিপূজা জন্ম নেওয়ার ও বিকাশের উর্বর জমি তৈরি করে। স্ট্যালিন নিজে এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। ১৯৩৪ সালে দলের সপ্তদশ কংগ্রেসে তিনি বিষয়টির প্রতি দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, "এর সঙ্গে যুক্ত করুন আমাদের দলের বেশিরভাগ কমরেডের তত্ত্বগত মান ততটা উঁচু না থাকা, পার্টি বডিগুলিতে আদর্শগত চর্চা যথেষ্ট না হওয়া এবং দলের ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভরা নিছক ব্যবহারিক কাজেকর্মে ভারাক্রান্ত থাকায় তত্ত্বজ্ঞান বাড়ানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রভৃতি বিষয়। তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন, লেনিনবাদের বহু প্রশ্নে বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ার মূল উৎস কোথায়।"

১৯৫২ সালে উনবিংশতিতম কংগ্রেসের রিপোর্টে হুঁশিয়ারি দিয়ে স্ট্যালিন বলেছিলেন, ".... আমাদের অর্জিত সাফল্যগুলি পার্টির সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এক আত্মসন্তুষ্টির

আটের পাতায় দেখুন

২১ মে'র সফল শিল্পধর্মঘট

লাগাতার ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিন

গত ২১ মে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সহ সাতটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আহবানে দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘট সফল হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণ বন্ধ, মালিকশ্রেণীর স্বার্থে শ্রমআইন পরিবর্তন বন্ধ, অবাধ আমদানি নীতি বাতিল, বোনাস আইনের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে ১২% হারে সুদ প্রদান, খেতমজুরদের জন্য সুসংহত আইন প্রণয়ন, দ্বিতীয় শ্রম কমিশনের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সুপারিশ বাতিল এবং বেকার-বীমা সহ সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প চালু প্রভৃতি ৮ দফা দাবিতে ছিল এই ধর্মঘট। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আসাম প্রভৃতি পূর্বভারতের রাজ্যগুলিতে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এমনকি বিজেপি শাসিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দীর্ণ গুজরাটেও শিল্পধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়। এজন্য শ্রমজীবী জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অনিল সেন লাগাতার ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী শ্রমিকস্বার্থবিরোধী নীতি প্রত্যাহার সুনিশ্চিত করার জন্য কারখানায় কারখানায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করার এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় জনবিরোধী শ্রমনীতি অনুসরণকারী রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন।

ধর্মঘটের পরে মালিকশ্রেণী তাদের অন্যতম হাতিয়ার সংবাদপত্রগুলির মারফৎ সোরগোল তুলে বলেছে, এই একদিনের ধর্মঘটে কত হাজার কোটি টাকা লোকসান হল, কত গরিব একদিনের রোজগার হারাল। এই কর্মনাশা ধর্মঘট কার স্বার্থে? তাই শ্রমিক-চাষি-মধ্যবিত্তকেও আজ পরিষ্কার করে বুঝতে হবে — এই ধর্মঘট কেন, কার স্বার্থে? কেন আজ শ্রমজীবী মানুষকে আন্দোলনের পথে যেতে হচ্ছে? কারণ তাদের সামনে আজ সমূহ বিপদ। বিরামহীনভাবে কর্মী ছাঁটাই চলছে। স্বেচ্ছাঅবসর প্রকল্পের নামে কার্যত বাধ্যতামূলক ছাঁটাই করা হচ্ছে, হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, লক আউট, লে-অফ, ক্লোজার চলছে অবাধে। নতুন করে নিয়োগ হচ্ছে না, কম বেতন দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, স্থায়ী চাকরির সুযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে শ্রমজীবী মানুষের সামনে এক গভীর অন্ধকার। ১৯৯১ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন উদার অর্থনীতি চালু করেন সেই সময় বলা হয়েছিল, এর ফলে শিল্পে বিনিয়োগ বাড়বে, বাড়বে কর্মসংস্থানের সুযোগ। কিন্তু বাস্তবে বিনিয়োগ যাই হোক, চাকুরির সুযোগ ও স্থায়িত্ব কমেছে। সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়া টু-ডে'র একটি সংখ্যায় কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের একটি সমীক্ষা রিপোর্ট উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, গত কয়েক দশকের ইতিহাসে এই প্রথম ২০০০ সালে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে গেল। ১৯৯৬ সাল থেকে এই হার কমেছে এইভাবে — ১৯৯৬ সালে ছিল ১.৫১ শতাংশ, ১৯৯৭ সালে ১.০৯ শতাংশ, ১৯৯৮ সালে .৪৬ শতাংশ। ১৯৯৯ সালে .০৪ শতাংশ এবং ২০০০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ০.১৫ শতাংশ। অর্থাৎ এই শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটবে কিন্তু কর্মসংস্থান হবে না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই সমৃদ্ধি, তাহলে কার সমৃদ্ধি? দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে কর্মচ্যুত করে বা কর্মহীন বেকারদের কাজ না দিয়ে চরম আর্থিক দুরবস্থায় ঠেলে দিয়ে কার সমৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে? আসলে মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর মুনাফার সমৃদ্ধি ঘটানোই এদেশের সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এজন্যই উদার অর্থনীতি নামক এই নিষ্ঠুর অর্থনীতির আমদানি। এই উদার অর্থনীতি মালিকশ্রেণীর প্রতি উদার, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি খড়্গহস্ত। ১৯৯১ সালে যখন এই উদার অর্থনীতির পক্ষে ব্যাপক জয়গান গাওয়া হচ্ছে সেই সময় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিল, এর ফলে কর্মসংস্থান ভয়াবহভাবে কমবে, চাকরির নিরাপত্তা রাখা হবে না এবং শ্রমিকশ্রেণীর যাবতীয় অধিকার একের পর এক হরণ করা হবে। সেদিনের সেই বিশ্লেষণ যে কত সঠিক ছিল আজ তা প্রমাণিত। তারপর কেন্দ্রে শাসকদল বদলেছে কিন্তু নীতি বদলায়নি। সংসদীয় রাজনীতিতে দলবদল হলেই যে সমস্যার সুরাহা হয় না, এই ঘটনা তাও দেখিয়ে দিল।

শিল্পধর্মঘটের সমর্থনে ২১ মে কলকাতায় শ্রমিক-কর্মচারী ও ছাত্র-যুবদের যৌথ প্রচার মিছিল

কংগ্রেসের বদলে মালিকশ্রেণীরই অপর দল বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে এবং পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের উদার অর্থনীতিই অনুসরণ করছে। মালিকদের অতি মুনাফার সুযোগ করে দিতে এই সরকারও সদাপ্রস্তুত। বাজপেয়ী সরকার খরচ কমাতে 'ব্যয় সংস্কার কমিশন' নামে একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি গড়েছিল কে পি গীতাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে। এই কমিটি সুপারিশ করেছে ৫ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর সংখ্যা ১০ শতাংশ কমাতে হবে। দু বছরের মধ্যে নতুন পদ সৃষ্টি করা যাবে না এবং যারা স্বেচ্ছা অবসর নেবেন না তাদের ছাঁটাই করে দিতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিভাগ তুলে দেওয়ার এবং বেসরকারীকরণের সুপারিশ করেছে এই কমিশন।

বেসরকারীকরণ হলে শিল্পে জোয়ার আসবে, একথাও প্রচার করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও হাল খুব খারাপ। উদার অর্থনীতির ফলে এখন বিদেশি পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুখ থুবড়ে পড়ছে বহু শিল্প। কিন্তু সেজন্য শ্রমিকরা দায়ী নয়। মালিক-ম্যানেজমেন্টের নির্ধারিত উৎপাদনের কোটা তাদের পূরণ করতেই হচ্ছে। কিন্তু বিদেশি মালিকদের পুঁজির জোর বেশি, অথবা তাদের পণ্যে নানা ভরতুকি থাকায় ভারতীয় শিল্প অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে। হিন্দুত্বের ধবজাদারী বিজেপি সেক্ষেত্রে ভারতীয় একচেটে পুঁজি ও বিদেশি মালটিন্যাশনালদের পক্ষ নিচ্ছে। ভারতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজি মুশকিলে পড়ছে। মালিকরা এখন সরকারি মদতে সঙ্কটের বোঝা চাপাচ্ছে শ্রমিকদের ওপর। আরও কম খরচে অধিক উৎপাদনের জন্য চলছে আরও একচেটিয়াকরণ আধুনিকীকরণ ও ব্যাপক ছাঁটাই। বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। মালিক কারখানার জমি বেচে পুঁজি উশুল করে নিচ্ছে। শ্রমিকরা পথে বসছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে যেখানে শ্রমিকদের চাকরি নিশ্চিত ভাবা হতো, আজ সেখানেও ছাঁটাই চলছে এবং লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি জলের দরে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। ৫,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের বালকো কারখানা বিক্রি হয়েছে মাত্র ৫৫ কোটি টাকায়, ২২০০ কোটি টাকার মডার্ণ ফুড বহুজাতিক হিন্দুস্থান লিভারের কাছে বেচে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৫০ কোটি টাকায়। এদেশের মানুষের অর্থে গড়ে ওঠা এই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি দেশি-বিদেশি মালিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকরা আজ দাঁড়াবে কোথায়?

অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রে, লক্ষ লক্ষ খেতমজুরদের বছরের কয়েক মাস বাদ দিলে সারা বছরই নির্দিষ্ট কোন কাজ নেই। কি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করবে তার কোন সংস্থানই নেই। মনুষ্যেতর জীবনযাপন করতে হয় এদের। ক্ষুদ্র চাষি-মধ্যচাষির অবস্থাও আজ বিপন্ন। কৃষিতে পুঁজিবাদের ব্যাপক ও গভীর প্রসারের ফলে সেচ, অতি উৎপাদনশীল বীজ, আধুনিক সার ও কীটনাশকের সাহায্যে কৃষি উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ অভুক্ত, তাদের খাদ্য কেনার পয়সা নেই। তাই কৃষিপণ্যের বাজার নেই। তার ওপর যতটুকু বাজার আছে তা নিয়ন্ত্রণ করছে কৃষি পণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা। মরশুমে তারা ফসলের দাম কমিয়ে দিচ্ছে। পরিণামে ফসলের দাম না পেয়ে চাষির আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা মুনাফা করতে গিয়ে যেভাবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস ঘটায় তা কৃষি এবং শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই বাজার সঙ্কটের জন্ম দেয়। পরিণতিতে বেকারসমস্যার সৃষ্টি, ছাঁটাই, ক্লোজার এই সমস্ত সঙ্কট দেখা দেয়। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর এই আন্দোলনের সঙ্গে গোটা সমাজের স্বার্থ জড়িত। এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদের এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটবে। কিন্তু তার আগে আশু সমাধানের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের যে যে নীতির জন্য এই সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে সেই নীতি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। একদিনের ধর্মঘটেই এই আন্দোলন সফল হয়ে যাবে না। লাগাতার ধর্মঘটের দিকে শ্রমিকশ্রেণীকে যেতে হবে। সেজন্য কলকারখানায় গড়ে তুলতে হবে দলমতনির্বিশেষে আন্দোলনের হাতিয়ার 'শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি'। শ্রমিকশ্রেণীকে আজ মালিকী ভাবধারার বিষপান করানো হচ্ছে, বলা হচ্ছে — বাস্তব মেনে নাও। চাকরি টিকিয়ে রাখাই এখন দায়, কাজেই মালিকদের যাবতীয় শর্ত মেনে চাকরি বাঁচাও। কোন কোন শ্রমিক তাতে বিভ্রান্তও হচ্ছে। শ্রমিক কি কোনদিন কারখানা বন্ধের দাবি জানিয়েছে? শ্রমিক ধর্মঘট করেছে চাকরি, ন্যায্য মজুরি ও চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে, বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতেই। শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে মালিকশ্রেণীর লাগাতার বিভ্রান্তিকর প্রচার এবং আক্রমণ সত্ত্বেও ২১ মে'র সর্বাত্মক সফল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের প্রতি শ্রমিকদের ব্যাপক সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। এই সমর্থনকে সংগঠিত রূপ দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলা আজ জরুরি কর্তব্য।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৪১ সংখ্যা

সি পি এম-এর এই জয় তার শক্তির পরিচয় নয়

একের পাতার পর

বিশেষভাবে তদন্তের পরই একমাত্র তাদের নিহত হওয়ার জন্য কারা দায়ী, তা নির্ণয় করা সম্ভব। কারণ ভোটের আগে চোপড়ায় ৪ জন সিপিএম কর্মী যেমন পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে, তেমনই একথা বহু ক্ষেত্রেই উঠেছে, ক্ষমতা ও অর্থের ভাগ বাঁটোয়ারার বিবাদ থেকে সিপিএম-এরই এক গোষ্ঠীর লোক অন্য গোষ্ঠীর লোককে হত্যা করাচ্ছে। এ জিনিস সিপিএম দলে বহুদিন ধরেই হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার মাত্রা বাড়লে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অনিল বিশ্বাস বলেছিলেন, তাদের দলের ব্যাপারে কারও মাথা গলাবার দরকার নেই। মাথা গলানোর দরকার হত না যদি না তারা নিজেদের অপরাধের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাতেন। আর একটা কথাও এখানে সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা যায়। প্রায় ২৭ বছর ক্ষমতায় থেকে পুলিশ দপ্তরকে তারা ওপর থেকে নীচু পর্যন্ত নিজেদের লোক বসিয়ে এমন করে ফেলেছেন যে, তা পুরোপুরি পার্টি দপ্তরে পরিণত হয়েছে। এ তো সর্বজনবিদিত যে, সিপিএম নেতাদের হুকুম ছাড়া পুলিশের পা নড়েনা। সিপিএমের কথায় তারা বিরোধী দলের লোকদের জেল খাটায়, হয়রানির চূড়ান্ত করে। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘিতে থানার ওসি-দের ডেকে নির্দেশ দিলেন, এস ইউ সি আই-র লোকদের সিপিএম মারলে পুলিশ যেন সিপিএম-কে সাহায্য করে। এবং তা তিনি করালেন ও এখনও করিয়ে চলেছেন। একাজ বহুদিন ধরেই তিনি করছেন। বারবার জানিয়েও কোন ফল হয়নি। এবারও কুলতলির মৈপীঠ অঞ্চলে সিপিএম যথেচ্ছ বুথ দখল করেছে। পুলিশকে আগে জানিয়ে এবং ভোটের দিন খবর দিয়েও কোন কাজ হয়নি। ১৯৮৯ সাল থেকেই মৈপীঠ অঞ্চলে সিপিএম পুরোপুরি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে।

এই রাজ্যে ক্রিমিনালরা অধিকাংশ সিপিএম আশ্রিত। কারণ সেখানে প্রোটেকশন বেশি। এই অবস্থায় সিপিএম-কে আক্রমণ করে নিজের বিপদ কেউ ডেকে আনতে চাইবেনা। ফলে বিরোধীদের কারণেই এবার সন্ত্রাস বেশি ঘটেছে — একথা সর্বৈব অসত্য। সুতরাং, সিপিএম কর্মীর মৃত্যুর সংখ্যা দিয়েই আদৌ প্রমাণ হয়না যে, তারা সকলেই অপর দলের সন্ত্রাসের শিকার।

এবারকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয়াবহ চেহারাটা একেবারে নগ্ন হয়ে যাওয়ায়, বিশেষ করে ভোটের দিনেই এত মানুষের মৃত্যু হওয়ায়, তা সর্বভারতীয় প্রচারমাধ্যমের খবর হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর 'আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসনে'র চেহারা এর দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাওয়ার বিপদ বুঝেই সিপিএম পলিটবুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি 'হিন্দুস্তান টাইমস্' পত্রিকায় (২৪.৫.০৩) একটি নিবন্ধ লিখে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সরকারে বসে সিপিএম গ্রামবাংলায় জমি বিতরণের দ্বারা গরিব মানুষের জীবনে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে, গরিব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ফলেই কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী, পূর্বতন জমির মালিকরা ক্ষিপ্ত। এবং তারাই গরিব মানুষের কাছ থেকে জমি ও অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের কব্জা আবার কায়েম করার জন্য প্রতিটি নির্বাচনকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে এবং সেজন্য প্রতিটি ভোটে এরাই সন্ত্রাস চালায়। সিপিএম নেতার মতে, এ হল শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম, যেখানে সিপিএম শোষিত গরিব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। সিপিএম নেতার এই দাবি যে কতটা হাস্যকর, তা নানা তথ্য তুলেই দেখানো যায়। আপাতত সেই বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েই বলা যায়, পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ জীবনে আজকের কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রধানত সিপিএম-এর ঝান্ডা নিয়েই চলে। গ্রামবাংলায় ঠিকাদার-ব্যবসাদার-আমলাতন্ত্র-পুলিশ ও মাফিয়াদের যে নতুন চক্র গড়ে উঠেছে, তার সাথে প্রত্যক্ষ গাঁটছড়া সিপিএম দল ও নেতাদেরই এখন অনেক বেশি। এ সত্য গ্রামবাংলার সাথে পরিচিত মানুষমাত্রই জানেন। শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম অবশ্যই গ্রামবাংলায় চলছে এবং সিপিএম সেখানে শোষিতের পক্ষে নয়, শোষকশ্রেণীর পক্ষেই কাজ করে চলেছে।

তাছাড়া, একথা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ২৬ বছর ধরে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালাচ্ছে শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর সমর্থনের জোরেই। সিপিএম ফ্রন্ট সরকার যদি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুরদের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করত, তাহলে সরকারি ক্ষমতায় বুর্জোয়ারা তাদের রাখতই না। বাস্তবে পুঁজিপতিশ্রেণী যে এখনও সিপিএম-কেই সরকারি ক্ষমতায় রাখতে চায়, এই দলের সরকারের পিছনেই যে শোষকশ্রেণীর পূর্ণ মদত কাজ করছে, সেটা আরও একবার পরিষ্কার হয়ে গেল নির্বাচনী সন্ত্রাস পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিবৃতি বা মন্তব্যকে যেভাবে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমে বাহবা দেওয়া হল, তার থেকে।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ অবধি ব্যাপক সন্ত্রাস ও হত্যা বন্ধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কিছুই করেননি। হাজার হাজার আসনে যখন বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতেই দেওয়া হলনা, এবং তার দ্বারা ভোটে দাঁড়াবার মৌলিক নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হল, তখনও মুখ্যমন্ত্রী কার্যত তা সমর্থন করেছেন। ভোটের দিন ব্যাপক বুথ দখল, সন্ত্রাস ও ১৮ জন মানুষের মৃত্যুর পরও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। এরই কিছুদিন পর ১৯ মে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি মন্তব্য করলেন যে, তাঁর দল সিপিএম-এও দুর্বৃত্ত ঢুকে পড়েছে। এমন একটি 'মহৎ উক্তির' জন্যই বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম যেন অপেক্ষা করছিল ! সকল প্রচারমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তির প্রশংসা বইয়ে দিয়ে বলা হল — মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য সিপিএম নেতাদের থেকে আলাদা, তিনি কেমন স্বীকার করলেন যে তাঁর দলে দুর্বৃত্ত আছে এবং তিনি তাদের দূর করতে চান। সিপিএম দল ও তাঁর অন্যান্য নেতারা যা স্বীকার করতে পারলেন না, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তা স্বীকার করে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি সৎ, তাঁর সরকার সৎ, তাঁর প্রশাসন সৎ। নির্বাচনী সন্ত্রাসের সমগ্র পর্বে বুদ্ধদেববাবুর সরকারের পূর্ণ মদতেই যে সিপিএম ব্যাপক সন্ত্রাস চালাতে পেরেছে — এই মূল কথাটাই এই প্রশংসার জোয়ারে চাপা দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর তথাকথিত স্বীকৃতিকে বড় প্রচার দিয়ে দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে যেন এবারের ভয়াবহ সন্ত্রাস কতিপয় দুর্বৃত্তের কাজ মাত্র, দলের উপরের নেতারা এটা চাননি, তাঁরা এই সন্ত্রাসের পরিকল্পনা করেননি। এটা যে কতবড় মিথ্যাচার, তা একটু ওয়াকিবহাল মানুষমাত্রই বোঝেন। নির্বাচনে বিরোধীদের দাঁড়াতেই না দেওয়া থেকে শুরু করে অধিকাংশ পঞ্চায়েত দখল করা পর্যন্ত — সমগ্র পর্যায়ে এবার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সিপিএম সন্ত্রাস চালিয়েছে, যেটা উচ্চ নেতৃত্বের ঠান্ডা মাথার পরিকল্পনা ছাড়া ঘটতেই পারত না, পুলিশের মদত ছাড়া সম্ভবই ছিলনা। এরপরও বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম মুখ্যমন্ত্রীর সততা, আন্তরিকতা নিয়ে গদগদভাব দেখাচ্ছে, তার কারণ বুর্জোয়াশ্রেণী এখনও সিপিএম-কেই সরকারে রাখতে চায়, তাতেই বুর্জোয়াদের লাভ।

গত বিধানসভা নির্বাচনেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় — জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সিপিএম। এই বিচ্ছিন্নতা যত বাড়ছে ও বাড়বে ততই গদি রাখার জন্য একদিকে তারা আরও নগ্নভাবে পুঁজিপতিদের সেবা করবে, অন্যদিকে ভোটে ব্যাপক কারচুপি সহ সন্ত্রাসের পথ নেবে। সিপিএম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ, বিরক্তি, ঘৃণা ও ক্রোধ দিনে দিনে এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শুধু জালভোটের উপর অথবা শুধু চাপা সন্ত্রাসের উপর নির্ভর করে ভোটে জয়ের আশা সিপিএম করতে পারছে না, তাই তাকে নগ্ন সন্ত্রাসের পথ নিতে হচ্ছে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন তারই প্রমাণ দিয়ে গেল। একথা একটি শিশুও বোঝে যে, ১৯৭৭-৭৮ সালে এই রাজ্যে যে জনসমর্থন সিপিএমের পিছনে ছিল, এখন যদি তা থাকত, তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এমন সন্ত্রাসের রাস্তায় সিপিএম-কে যেতে হত না। ফলে, এই জয় সিপিএমের শক্তির পরিচয় নয়, এ তার দুর্বলতা ও জনবিচ্ছিন্নতারই পরিচয়।

দেশের মধ্যে আজও যতটুকু গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে, এভাবে ভোট করার দ্বারা, তাকেই ধ্বংস করছে সিপিএম। শুধু তাই নয়, সিপিএমের হাতে লাল ঝান্ডা থাকার দরুন, এবং দলটি বামপন্থী, এমনকি মার্কসবাদী নাম নিয়ে চলার ফলে, তাদের এই ভূমিকা বামপন্থাকেও কলঙ্কিত করছে। এমনিতেই সিপিএম-এর দীর্ঘ অ-বাম শাসন বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে। তার উপর এই সন্ত্রাসের রাজনীতি বামপন্থাকে আরও কালিমালিপ্ত করার সুযোগ দক্ষিণপন্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছে এবং ভয়াবহ স্বৈরাচারি ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থানের জমি করে দিচ্ছে।

এদেশে সিপিএম-কে মার্কসবাদী দল রূপে দেখিয়ে, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা নতুন নয়। এরাজ্যে সেটা বহুদিন ধরেই চালানো হচ্ছে, যার ফলে বহু মানুষের মধ্যে মার্কসবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। এবারও সিপিএম-এর সন্ত্রাসকে দেখিয়ে একটা মহল প্রচার করছে যে, মার্কসবাদীরাই এরকম হয়, তারা বিরুদ্ধ মতকে, বিরোধী শক্তিকে সহ্য করেনা, বিরোধী দলকে নির্মূল করে দেয়। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এরা মহান স্ট্যালিনের রাশিয়া, মহান মাও সে-তুঙের চীনের কথা বলছেন। এসব যাঁরা বলছেন, তাদের অজ্ঞ-মূর্খ বলে ধরে না নিলে, বলতেই হয় যে, সব জেনেশুনেই এরা উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার করছেন। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে গদি রাখার জন্য যা করছে, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে কংগ্রেস কিংবা অন্য কোনও জাতিবাদী দল এবং সম্প্রতি গুজরাটে বিজেপি'র নরেন্দ্র মোদীও, ভিন্ন কায়দায় একই কাজ করেছে। তাহলে নরেন্দ্র মোদী কি মার্কসবাদী ? বাস্তবে সিপিএমের ভূমিকার সাথে কোনদিনই মার্কসবাদের সম্পর্ক ছিলনা, এখনও তা নেই। গদি ও মন্ত্রীত্বই সিপিএমের নীতি ও আদর্শ।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাস্তবে সন্ত্রাসই একমাত্র ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দল এস ইউ সি আই গণআন্দোলনের রাজনৈতিক লাইন নিয়েই এবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সিপিএমের অপশাসনে গ্রামীণ গরিব মানুষের জীবনে যে সংকট দেখা দিয়েছে, খেতমজুরদের কাজের সমস্যা তীব্র হয়েছে, নতুন করে সরকার যে খাজনা-সেস বাড়াচ্ছে — এসবের হাত থেকে বাঁচার জন্য গণআন্দোলনই একমাত্র পথ। আবার সন্ত্রাসকেও প্রতিরোধ করতে পারে একমাত্র গণআন্দোলনই। আমাদের দলের এই রাজনীতির প্রতি জনগণের সমর্থন আমরা অনুভব করছি। যেজন্য প্রবল সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়েও জনগণের ভোটে আমরা বেশ কয়েকটি নতুন পঞ্চায়েতে গরিষ্ঠতা পেয়েছি। অবশ্য পুরানো কিছু পঞ্চায়েতের আসন আমাদের হারাতেও হয়েছে।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন, নির্বাচনে যদি পুরোপুরি সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকত. খোলামেলা পরিবেশে সমস্ত দল প্রচারকার্য চালাতে পারত, মানুষ নির্ভয়ে নিজের পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দিতে পারত তাহলে সার্বিকভাবে নির্বাচনের ফল ভিন্ন হত। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি ক্রমাগত এর বিপরীত দিকেই যাচ্ছে। পুঁজিবাদের সংকট যত তীব্র হচ্ছে এবং ডান-বাম নির্বিশেষে পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দল ও নেতাদের অর্থ ও ক্ষমতার লোভ যত বাড়ছে, তত রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বাড়ছে এবং ভোটও দিনের পর দিন তত প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে একমাত্র জনগণ। তাদের সচেতন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধই পারে এই অবস্থার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে। আমরা আশা করব জনগণ অতি দ্রুত এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে আসবেন।

ব্রাসেলস্ সেমিনার

ছয়ের পাতার পর

মনোভাব, 'সব কিছু ঠিক আছে' জাহির করার মানসিকতা ও আত্মম্ভরিতার জন্ম দিয়েছে।'' তিনি দলের অভ্যন্তরে এক তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম শুরু করার পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯৫৩ সালেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আজ যদি আমরা স্ট্যালিনের বিপ্লবী রাজনীতির ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে সংগঠন, চিন্তাভাবনা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে আমাদের আদর্শগত সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রাম, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী, একমাত্র লেনিনবাদের মূল বিষয়গুলির সঠিক উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধি ও কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের অবদান ও সংগ্রামকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়ার ভিত্তির উপরই একমাত্র গড়ে উঠতে পারে। অন্যথায় সংশোধনবাদে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবেই।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net